বসন্তে ভ্যালেন্টাইন

বসন্তে ভ্যালেন্টাইন

আতাউর রহমান কানন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন: ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : বাইজিদ আহমেদ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন: ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা

Basante Valentine by **Ataur Rahman Kanon**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price: 250.00
US $ 10

ISBN 978 984 95130 1 8

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪
http://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে

০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

সহধর্মিণী— সেহেলী আহমেদ রুনা
ও
নাতি— রাহিদ রহমান

লেখকের বইসমূহ :

কাব্য :
কবিতার ধ্রুবতারা
বরফ জমেছে মনে
সাংকেতিক ভালোবাসায় ডায়না
এই প্রেম এই আমি
নানা বর্ণের ফুল
ছন্দে ছন্দে মন

উপন্যাস :
কপাল
অবেলা বসন্ত
ঢেউ ভাঙা প্রেম
শেষের প্রেম
মেঘের কোলে রোদ
রিমি ফিরে এসেছে
বসন্তে ভ্যালেন্টাইন
মার্চের পর মার্চ

ভ্রমণকাহিনি :
ভ্রমণ দেশে-বিদেশে
ভ্রমণকথা
ভ্রমণবিলাস
ভ্রমণ পূর্ব-পশ্চিম

গল্প :
কিছু স্মৃতি কিছু কথা এবং আমার দেশ
শাপলা পরীর দেশে

নাট্যসমগ্র :
রোগ পাঁচালী

স্মৃতিকথা :

আজকের প্রথম পিরিয়ডের ক্লাস শেষ। আরেকটা ক্লাস হবে লাঞ্চের পর। মাঝখানে দীর্ঘবিরতি। বৃহস্পতিবারের ক্লাস রুটিনটা বেশ বেখাপ্পা। সকালে এসে বলতে গেলে সারাদিনই ক্যাম্পাসে থাকতে হয়। আর অনার্স শেষ সেমিস্টারের এই দুইটা ক্লাসই খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ফাঁকি দিলে নিজেরই ক্ষতি। ক্লাস শেষে হুড়মুড় করে যে যার মতো বেরিয়ে গেছে। রিপা সিঁড়ি দিয়ে নেমে বটতলায় এসে দাঁড়িয়েছে। শীতের শেষে ফাল্গুনের মন-উদাসী হাওয়া বইছে। এবারের পঞ্জিকার হিসেবে আগামীকাল পয়লা ফাল্গুন। সে মনে মনে ভাবছে কোন দিকে যাবে— টিএসসি না লাইব্রেরি।

রিপা, তুই এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস? তোর বডিগার্ড কই?

পেছন থেকে জলি কথাগুলো বলতে বলতে পাশে এসে দাঁড়াল।

রিপা একগাল হেসে বলল, বডিগার্ড চুল ছাঁটাতে নিউমার্কেট গেছে।

জলি বলল, এখানে দাঁড়িয়ে কী করবি? এখন যখন ক্লাস অফ, চল, আমরাও নিউমার্কেট যাই।

—না রে ওদিকে না। ওর সাথে যেতে চেয়েছিলাম, ও আপত্তি জানিয়ে একাই চলে গেল। আমরা গেলে মাইন্ড করতে পারে। তার চেয়ে চল আমরা টিএসসি যাই।

—ঠিক আছে তাই চল।

দুই ক্লাসমেট-বান্ধবী টিএসসির দিকে রওনা করল। পথে আরেক বান্ধবী ইলার সাথে দেখা। সেও ওদের সঙ্গী হলো। ইলাও রিপাকে তার বডিগার্ডের কথা জিজ্ঞেস করল। রিপা তাকেও একই জবাব দেয়।

টিএসসিতে তিন বান্ধবী বেশ চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল। এরই মধ্যে মোবাইল করে রিপার অবস্থান জেনে নিয়ে সেখানে বডিগার্ড ইমন এসে হাজির হয়।

রিপা ও ইমন দুই বোন। ওরা একই বিশ্ববিদ্যালয়ে একই ইয়ারে পড়ে। ওদের সাবজেক্টও এক। তবে বেশভূষা পোশাক-আশাক এবং চালচলন ভিন্ন। রিপা জন্মানোর পর বাবা-মায়ের খুব শখ চাপছিল একটা পুত্রসন্তানের। কিন্তু পরের সন্তান জন্ম নেওয়ার পর দেখা গেল কন্যা। শখ যখন আর পূরণ হলো না তখন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো মেয়ের নাম রাখলেন ইমন। আর তাকে প্রথম দিন থেকেই ছেলেদের ড্রেস পরাতে লাগলেন।

দুই বোনের বয়সের পার্থক্য দেড় বছর। প্রাথমিক স্কুল পর্যন্ত দুই বোন এক ক্লাস ওপর-নিচ ছিল। কিন্তু ক্লাস সিক্সে গিয়ে দুজন ভালো স্কুলে ভর্তির নামে এক হয়ে গেল। ছেলেদের ড্রেস পরে অভ্যস্ত ইমন মেয়েদের স্কুলে পড়তে গিয়ে প্রথম প্রথম স্কুলড্রেস পরা নিয়ে বেশ সমস্যা করেছে। পরে অবশ্য অভ্যস্ত হয়ে কলেজ পর্যন্ত তা মেনে নিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর পোশাক-আশাক নিয়ে আর সমস্যায় পড়তে হয়নি। ইমন পুরোপুরি ছেলেদের বেশভূষায় ছেলে বনে গেল।

জলি ইমনকে দেখে বলে উঠল, রিপা বডিগার্ড হাজির।

সবাই ইমনের দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল। জলি তখন হাসতে হাসতে বলল, দেখ দেখ বডিগার্ড ক্যামন ছাঁট দিয়ে এসেছে! আর্মি ফেল।

ইমন ওদের কাছে বসতে বসতে বলল, আরে লেডিসরা, সব সময় মানজা মাইরা হুর সাইজা থাকতে থাকতে তোদের আর মানসিক উন্নতি ঘটল না।

ইলা হেসে ইমনের গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে বলল, মেয়েমানুষ

পুরুষ সাজলে কি মানসিক উন্নতি ঘটে?

ইমন তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, ঘটেই তো!

—ক্যামন সেটা বডিগার্ড?

—ছেলেদের দৃষ্টি।

—আর তোর বেলায়?

—অন্তত ছেলেদের কুদৃষ্টি পড়বে না।

এবার জলি হাসিমাখামুখে বলল, বন্ধু, আমার দৃষ্টি যে সব সময় তোর ওপর তা কি জানিস?

—ইমন বলল, তাতে বৃথাই সময় নষ্ট। ওই দ্যাখ পেছনে কে এসেছেন।

জলি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে তার বয়ফ্রেন্ড নাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। রিপা জলির পাশে বসা ছিল। সে খানিকটা সরে বসে নাহাজকে বসতে বললে, নাহাজ বসতে বসতে বলল, তোদের আড্ডায় ডিসটার্ব হবে না তো?

ইমন বলল, সোজা করে বল, জলিকে নিয়ে অন্য কোথাও যাওয়ার প্ল্যানে এসেছিস।

ইমনের দিকে তাকিয়ে নাহাজ বলল, তুই এত কিছু বুঝিস ক্যামনে?

—আমি না শুধু ওরাও বুঝেছে, জিজ্ঞেস কর না।

—কী বুঝেছে?

—তোর মতলব বুঝেছে। আগামীকাল ভ্যালেন্টাইন ডে। তোরা আজ ভালোবাসার প্ল্যান করবি, শপিং করবি আর কী কী করবি তাই...হাহাহা করে হেসে উঠল ইমন।

—আস্তা একটা ফাজিল হয়েছিস। তুই ছেলে হলে এখনই দিতাম কয়েকটা লাগিয়ে।

—লাগা না, আমি কি দেখতে মেয়ে নাকি?

এমন সময় রাহি এসে উপস্থিত। সে ওদের হইচইয়ের আগামাথা কিছুই না বুঝে ইলার পাশে বসে পড়ল। ইমন তা দেখে বলে উঠল, ওই যে এসে গেছে আরেক প্রেমিক। ইলা তুইও যা ভালোবাসার প্ল্যান করগে। 'বসন্ত এসে গেছে— বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল

নেশা, কারা যে ডাকিছে পিছে, বসন্ত এসে গেছে...'। আগামীকাল বকুলতলায় দেখা দিস।

জলি বলল, ইমন থামলি কেন দোস্ত, গেয়ে যা-না।

—তোরা গা। তোদের মতো আমার অত বসন্ত নাই। কী বসন্ত কুমার রাহি, ভুল বলেছি নাকি?

রাহি বলল, বডিগার্ড তুই ঠিকই বলেছিস, তবে তোর মনেও যে বসন্তের ঢেউ খেলে যাচ্ছে তা তো ধরা পড়ে যাচ্ছে।

ইলা বলল, ধরা পড়ে যাচ্ছে না, গেছে। নকল নর সেজে থাকলেই কি নারীর রং আড়াল থাকে? বডিগার্ড, তুই তোর নকল সাজ ঝেড়ে ফেলে আমাদের দলে আয়। জীবন উপভোগ কর।

—আমি নকল সাজে সাজি না। ওটা তোদের কাজ। ফেসপাউডার-লিপস্টিক-আইব্রু-আইশেড-মাশকারা এসব কত কী মাখামাখি-ঘষাঘষি করে তোরা নকল সং সাজিস! আচ্ছা, তোরা এসব কেন করিস বল তো?

জলি বলল, তুই যখন জানিস না তোর আর জেনে কাজ নাই। চল রিপা, ক্লাস শুরুর আর বেশি সময় নাই।

জলি উঠে দাঁড়াল। সেইসাথে অন্যরাও উঠল। হাঁটতে হাঁটতে ইলা ও রাহি পেছন থেকে কেটে পড়তে পড়তে বলল, তোরা যা আমরা আসছি।

ঘাড় ঘুরিয়ে ইমন হো-হো করে হেসে বলল, কী বলছিলাম না? এখন দ্যাখ, ঠিকই ভালোবাসার প্রস্তুতি নিতে কেটে পড়ছে।

জলি বলল, ওরা যায় যাক, তাতে তোর কী? আমরাও তো ক্লাস শেষে শপিঙে যাব।

—তা তো যাবিই কিন্তু লুকোচুরি খেলা কেন?

—কোনো লুকোচুরি খেলা না বডিগার্ড। আর এসব তোর পাতিলছাঁট মাথায় ধরবেও না। তার চেয়ে তুই তোর সিস্টারকে আগলে রাখ; ওকে যেন কেউ টান মেরে নিয়ে না যায়— কথাগুলো বলতে বলতে রিপাকে ধরে হিহি করে হাসিতে ফেটে পড়ল জলি।

কথায় কথায় ওরা ক্লাসে ঢুকে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই শিক্ষক এসে ঢুকলেন। স্যার আজ বাসন্তী কালারের বাটিকপ্রিন্ট হাফহাতা শার্ট

পরেছেন। ইমন মনে মনে ভাবল, স্যার মনে হয় জানে না এবার থেকে পয়লা ফাল্গুন যে একদিন পিছিয়ে গিয়ে ভ্যালেন্টাইন ডেতে গিয়ে একাকার হয়েছে। কথাটা তার ভাবনায় আটকে থাকল না, সে ফিসফিস করে তার পাশে বসা জলিকে বলল।

জলিও ফিসফিসিয়ে বলল, স্যারের মতো অনেকেই জানে না। অতীতে তো কখনো এমন হয়নি। পৃথক দুটি দিনে দুটি উৎসব হতো।

ইমন বলল, এবার ফুল ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত।

—তা কেন হবে?

—আরে বোকা, আগে দুই দিন উৎসব থাকত তাতে দুদিনই দেদারসে ফুল বেচত, এবার তো উৎসব একদিন।

—তা তো ভাবিনি!

—ভাববি ক্যামনে? মেয়েমানুষের মাথায় অত বুদ্ধি থাকলে তো।

জলি এ কথা শোনার সাথে সাথে ইমনের পেটে তর্জনীর খোঁচা দিলে ইমন উহ্ করে ওঠে।

বিষয়টি ফিলোসফির সিনিয়র প্রফেসর আজমান আলি সাহেবের দৃষ্টি এড়াল না। তিনি ওদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী হয়েছে তোমাদের? এই যে, এই ছেলে এই মেয়ে, তোমরা শুনছ? দাঁড়াও দুইজন। কী হয়েছে, আমরাও শুনি!

ইমন ও জলি এ ওর দিকে তাকিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রফেসর সাহেব ইমনকে উদ্দেশ করে বললেন, এই ছেলে, তোমার নাম কী? তুমিই আগে বলো।

প্রফেসর সাহেবের এ কথায় ক্লাসে হাসির রোল উঠল। প্রফেসর সাহেব এ হাসির কোনো মানে বুঝতে পারলেন না। তিনি শুধু এদিক-সেদিক তাকালেন। হাসি থামলে তিনি বললেন, মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই কোড নট আন্ডারস্ট্যান্ড সাস্ এ টাইপ অব স্মাইলিং!

প্রফেসর সাহেবের ইংরেজি বাক্য শুনে ক্লাস একেবারে থমথমে হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলছে না। তখন প্রফেসর সাহেব ইমনের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, আচ্ছা, তুমিই বলো, তোমাদের কী হয়েছে?

—স্যার, আমাদের তেমন কিছু হয়নি। তবে অভয় পেলে বলতে

পারি।

—অভয় সবাইকে দিলাম, তোমরা মন খুলে তোমাদের কথা বলতে পারো।

তখন নাহাজ ফট করে দাঁড়িয়ে ইমনের দিকে তর্জনী তুলে বলল, স্যার, ও তো ছেলে না, মেয়ে।

আবার ক্লাসে হাসির ঢেউ খেলে গেল।

প্রফেসর সাহেব কিছুক্ষণ বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে থেকে ঢোক গিলে বললেন, তাই বলো; কিন্তু ওকে তো... আচ্ছা, থাক থাক। এরপর তিনি ইমনকে বললেন, তুমি যেন কী বলতে চেয়েছিলে, বলো?

—স্যার, আপনি মনে হয় আজ বসন্তের প্রথম দিন ভেবে শার্টটা পরে এসেছেন। তবে শার্টটা খুবই সুন্দর!

—তাই নাকি? ফাল্গুন কবে?

—আগামীকাল।

—আগামীকাল তো তোমাদের ভ্যালেন্টাইনস ডে।

—এবার থেকে স্যার দুই দিবস এক হয়ে গেছে।

—আগে তো কখনো এমন হয় নাই। তাই আমার এ দশা! আচ্ছা বোসো, বোসো।

ক্লাস শেষে প্রফেসর সাহেব আশেপাশে ভালো করে খেয়াল করে দেখলেন, সত্যিই তো, কেউ তার মতো আজকে বসন্তের কোনো ড্রেস পরে আসেনি। তারপর একেবারে লাল-হলুদের কাজ করা আনকোরা চকচকে শার্ট পরে এসেছেন! নিজেকে বেশ বোকা বোকা মনে হতে লাগল। তিনি ভাবলেন, সকালে যখন বাসা থেকে বের হই তখন তো সোহানার সামনে দিয়েই বের হয়েছি, কই, সে তো ভালোমন্দ কিছুই বলেনি! তবে সোহানাও কি তার মতোই সব ভুলে গেছে? বয়স হলে মনে হয় মানুষের এমনই হয়। অথচ এই সোহানা সারাজীবন ফ্যাশনপ্রিয়। কবে বৈশাখ, কবে নবান্ন, কবে বসন্ত, কবে জন্মদিন, কবে বিবাহবার্ষিকী এসব কখনো তাকে মনে করানোর প্রয়োজন পড়েনি। নিজের বেশভূষায় নিজে বেশ সজাগ থেকে আমারটাও তার পছন্দেই হয়। এইবারের এই শার্টও তো সে কদিন আগেই কিনে এনেছে। তবে মেয়েটা বাসায় থাকলে এই কাণ্ডটা কক্ষনো ঘটত না।

সে সকালেই একটা কাজে বেরিয়ে গেছে।

প্রফেসর সাহেব নিজের চেম্বারে ঢুকেও মনের মধ্যে শান্তি পাচ্ছিলেন না। কেমন যেন একটা অস্বস্তি লাগছিল। চেম্বারে কোনো একস্ট্রা শার্ট থাকলে তিনি সাথে সাথে বদলিয়ে ফেলতেন। তার আজ আর কোনো ক্লাস না-থাকায় তিনি বাসার দিকে রওনা দিলেন। গাড়িতে বসে ভাবলেন— এজন্যই বুঝি আজ অনেকেই আমার দিকে যেন ক্যামন করে তাকাচ্ছিল। যাক, এখন গাড়িতে উঠে গেছেন, কেউ আর দেখবে না। তবে বাসায় ঢোকার সময় মেয়েটার সামনে পড়া যাবে না। তাহলে আরেকবার লজ্জায় পড়তে হবে।

'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়'— প্রবাদটি প্রফেসর সাহেবের মনে পড়ল। তিনি বিচলিত হলেন। ধরেই নিলেন প্রবাদটি ফেলনা না। তিনি ভাবলেন, আজ নির্ঘাত মেয়েটার সামনে পড়বই। আর অমনি সাথী আমাকে দেখে মিটমিটিয়ে হেসে বলবে, 'বাবা, আজ তো পয়লা ফাল্গুন না। তুমি এ শার্ট পরেছ যে!' তখন মুখ বুজে থাকা ছাড়া আমার আর বলার কিছুই থাকবে না।

তিনি পরক্ষণেই ভাবলেন— মেয়ের কাছে লজ্জা পাওয়ার কী আছে? ওকে বলব, মা, এবার তো পয়লা ফাল্গুন মিশে গেছে ভ্যালেন্টাইন দিবসের সঙ্গে। আমি তো আর ওইসব বিজাতীয় দিবস পালন করি না, তাই আজকেই পরে নিলাম।

তখন সাথী নিশ্চয়ই বলবে, বাবা বেশ করেছ। ওইসব আমদানি করা কালচার আমাদের বর্জন করাই উচিত। আমাদেরই দিবসের অভাব নাই।

অবশ্য আমাদের পিতা-কন্যার কথা ওর মা সোহানা শুনতে পারলে বলবে, বাবাকে যে বড্ড সাপোর্ট করে কথা বলছিস? তোর বাপেরে যে আজকাল আত্মভোলা রোগে ধরেছে সেটা খেয়াল করছিস না!

মেয়েটা অবশ্য তার মায়ের এ কথায় বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠে বলবে, মা, তুমি কী আবোল-তাবোল বকছ! বাবা ঠিকই আছে।

সোহানা বলবে, তোর বাবাকে নিয়ে নিশ্চয়ই আজ তার ছাত্রছাত্রীরা হাসাহাসি করেছে। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করে দ্যাখ।

সোহানা এমন কথা যে বলবে, এটা মনে হতেই তিনি আবার অস্বস্তিতে পড়লেন। তিনি শুধু মনে মনে চাইলেন, প্রবাদটি যেন মিথ্যা হয়, মিথ্যা হয়।

গাড়ি বাসার পোর্চে এসে থামতেই তিনি এদিক-সেদিক তাকিয়ে দ্রুত নেমে সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় নিজের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে গিয়ে কলিংবেল টিপলেন। বুকটা তখন কেন যেন ঢিপঢিপ করছিল। দরজা খুলল কাজের বুয়া রহিমার মা। তিনি কারো সামনে পড়লেন না। সোজা নিজের ঘরে ঢুকে শার্টটি দ্রুত চেঞ্জ করে একটা স্বস্তির দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

এদিকে প্রফেসর সাহেব ক্লাস থেকে বের হওয়ার সাথে সাথে ক্লাসরুমে হাসির ফোয়ারা বয়ে গেল। সেই হাসির ফোয়ারায় ফুলের পাপড়ি ছিটানোর মতো অনেকেই নানা কথার ফুলঝুরি ছড়াতে থাকল।

জলি বলল, বেচারা প্রফেসর সাহেব আমাদের জব্দ করতে গিয়ে নিজেই কেমন জব্দ হয়ে গেলেন!

নাহাজ বলল, স্যারের বউটা মনে হয় কেলাস। স্বামীর প্রতি কোনো কেয়ার নাই।

ইমন গলা ফাটিয়ে বলল, এটা আর এমন কী— বউরা এমনই হয়।

জলি আবার বলল, সব বউ ঠিক না। বল, শুধু স্যারের বউ।

ইমন বলল, কেন রে, তুই কী বলতে চাস, তুই বউ হলে এমন হবে না? নাহাজ, শুনে রাখ ভালো করে।

ক্লাসে আবার হাসির খানিকটা ঢেউ বয়ে গেল। আজ আর ক্লাস না-থাকায় স্টুডেন্টরা বেরিয়ে যাচ্ছে। রিপা এতক্ষণ কথা বলার চান্স পাচ্ছিল না। সে বলল, স্যারকে নিয়ে তোরা হাসাহাসি বাদ দে তো! বয়স্ক স্যার নিয়ে এসব করা ঠিক না।

জলি হাসতে হাসতেই বলল, শেষ পর্যন্ত স্যারের প্রেমে গদগদ! ভালো ভালো! এর আগেও স্যার একবার হাফশার্টের বোতাম আগপিছ করে লাগিয়ে এসেছিলেন— সেবার কিন্তু তুই-ই প্রথম হাসছিলি, মনে আছে?

রিপা বলল, মনে থাকবে না কেন? ঠিকই আছে। তবে—

—তবে কী?

—তবে মানে, স্যার যখন ভালো পড়ান, তাই তার অন্য দোষত্রুটি দেখতে নাই। আর দার্শনিক মানুষ এমন না হলে মানায় না।

—আরে তুই তো দেখছি আরেক দার্শনিক! সাবজেক্টটা তোর কাজে লাগবে রে।

—ওই যে তোর দার্শনিক নাহাজ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে, ওর পাশে যা।

ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে কথায় কথায় ওরা নিচে নেমে এসেছে। একে একে কিংবা জোড়ায় জোড়ায় চলে যেতে থাকল। জলি-নাহাজ রিকশায় উঠল নিউমার্কেট যাওয়ার জন্য। আর রিপা-ইমন রিকশা নিল বাসায় ফেরার। দুই রিকশার গন্তব্য বিপরীত দিকে। রিকশার পা-দানিতে পা রেখে হাত নেড়ে জলি-নাহাজের উদ্দেশে ইমন বলল, ভ্যালেন্টাইন-জুলিয়া, মিট ইউ টুমরো।

রিপা-ইমনদের বাসা সিদ্ধেশ্বরী। ওদের রিকশা হাইকোর্টের সামনে দিয়ে সেগুনবাগিচা হয়ে শান্তিনগর মোড়ে আসতেই প্রায় দেড়ঘণ্টা পার হয়ে গেল। বিকালবেলায় এ রাস্তায় এখন চলাই মুশকিল হয়ে গেছে। ইমন খুবই ছটফট করছিল। সে বলল, শালার এ দেশে রিকশায় বসে থাকতে থাকতে বাত হয়ে যাবে। চল, আপু, বাকিটুকু হাঁটতে হাঁটতে যাই, তাতে কোমরধরা সারবে।

রিকশা ছেড়ে দুই বোন হাঁটতে লাগল। একটু যাওয়ার পর রিপা বলল, একটু কেনাকাটা ছিল। চল, 'বেইলি স্টার' হয়ে যাই।

ইমন বলল, কীসের কেনাকাটা, আগে তো বলিসনি?

—এখন মনে পড়ল, তাই।

—তোকে কি আবার ভ্যালেন্টইন রোগে পেয়েছে নাকি?

—ধ্যাৎ ফাজলামো করবি না। চল তো!

—চল। তবে ফাজলামো না। ডুবে ডুবে যদি জল খাস আর আমার হাতে ধরা পড়িস তখন কিন্তু বুঝবি আমি কী?

—তুই কী?

—ওই যে তিন বছর ধরে যে ক্যারাটে শিখে ব্ল্যাক বেল্ট নিয়েছি তা ওর ওপর দিয়ে প্র্যাকটিক্যাল হবে।

—আচ্ছা, আগে ধরা পড়ে নিই, তারপর দেখা যাবে।

ওরা বেইলি স্টার শপিংমলে ঢুকে গেল। বসন্ত আর ভ্যালেন্টাইন ডে উপলক্ষ্যে দোকানিরা মার্কেটটা সাজিয়েছে বেশ ঝলমলে চোখধাঁধানো। আর কাস্টমারেরও অভাব নেই— গিজগিজ করছে।

ইমন হাঁ হয়ে এদিক-সেদিক দেখতে লাগল। এ মার্কেট তো তার কাছে নতুন কিছু না। বলা যায় ওদের বাড়িরই মার্কেট। এমন কোনো মাস নেই যে কয়েকবার এখানে আসতে হয় না। কিন্তু এরকম জৌলুস সাজসজ্জা তো আগে অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষ্যে দেখেনি। সে বলল, আপু, এ তো বিয়েবাড়ির সাজসজ্জাকেও হার মানিয়েছে!

—উৎসবকে কেন্দ্র করে সব সময়ই তো দোকানদাররা সাজায়— এ আর নতুন কী?

—দোকানিরা বেশ কৌশলী বলতে হয়! কাস্টমারদের আকৃষ্ট করে তাদের গলা কেটে এসবের খরচ সব ওঠায়ে নিবে।

—তা তো নিবেই। এসব নিয়ে তোর এত গবেষণার দরকার নাই। চল, ওপরে যাই।

দুই বোন দোতলায় যেই উঠেছে অমনি 'বডিগার্ড' ডাক শোনা গেল। ইমন ঘাড় ঘোরাতেই দেখে ইলা-রাহি জুটি। তাদের হাতে শপিং ব্যাগ। তাদের কাছে গিয়ে ওরা দাঁড়াল। ইলাকে উদ্দেশ করে রিপা বলল, বাবাঃ, এত শপিং! কী কিনলি রে?

ইলা জবাব দেওয়ার আগেই ইমন বলল, কী আর কিনবে, ভালোবাসার ড্রেস। ওই ড্রেস ছাড়া তো আর ভালোবাসাবাসি হয় না যে।

সবাই হেসে উঠল। হাসি থামলে ইলা বলল, তোরা কী কিনলি রে?

ইমন বলল, আমরা দেখতে আসছি।

রাহি বলল, কী দেখতে এসেছিস?

—এই তোদের, ভ্যালেন্টাইন-জুলিয়াদের।

—তা ভালো। তবে শুধু দেখলেই হবে না, তোরাও দেরি না করে ভ্যালেন্টাইন জুটিয়ে নে।

রিপা বলল, ভ্যালেন্টাইন যখন আসবে, আসবে। তা তোদের শপিং কি শেষ না আরো আছে?

ইলা বলল, আরেকটু বাকি আছে।

—ঠিক আছে। তোরা তোদের শপিং সেরে বুমার্সে যা, আমরা আসছি। না বলে আবার কেটে পড়িস না কিন্তু!

ইমন বলল, কেটে পড়বে মানে? ধরে নিয়ে আসব না?

রাহি বলল, না দোস্ত, কাটব না। তোর হাতে ধরা খাওয়ার চেয়ে সারাদিন বসে থাকা অনেক ভালো।

রিপা হাসতে হাসতে বলল, সারাদিন বসে থাকতে হবে না। তোরা কাজ সেরে ওখানে গিয়ে বস, আমরা আসছি।

ইলা-রাহি ওদের মতো কেনাকাটা করার জন্য চলে গেল। ইমনকে নিয়ে রিপা দোকানে দোকানে ঢু মারতে থাকে। ইমন যেন অনিচ্ছা আর রাজ্যের বিরক্তি নিয়ে বড়ো বোন রিপার পেছনে পেছনে হাঁটছে। সে একটা সময় রিপাকে বলল, আপু, তুই তোর শপিং ঝটপট সেরে নে তো। ফালতু ঘোরাঘুরি ভাল্লাগে না।

ওরা একটা ড্রেসের দোকানে ঢুকল। দোকানে বেশ ভিড়। সেলসম্যানদের কথা বলার সময় নেই। অন্য সময় হলে ডাকাডাকির অন্ত থাকে না— পারলে কোলে করে দোকানে ঢোকায়। আজ আর সেই কদর নেই। ভিড় ঠেলেই ওরা দোকানে ঢুকে পোশাক পছন্দ করতে থাকে। এবার বেশিরভাগ ড্রেসই লাল-বাসন্তী কালারের সমাহারে তৈরি। ডিজাইনকারীরা যে দুই দিবসের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করেছে তা অন্ধ ছাড়া সবাই বুঝবে।

রিপা অনেক চেষ্টায় ইমনের জন্য এক কালারের একটা বসন্তবরণের লেডিস ড্রেস পছন্দ করল। কিন্তু ইমন কিছুতেই সে লেডিস টাইপ ড্রেস নিবে না। এরপর তাকে আরো কয়েকটি ড্রেস দেখানো হয়, তাতেও তার ঘোর আপত্তি। শেষমেশ তাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে একটা বাসন্তীরঙা হাফহাতা শার্ট গছানো গেল। সেলসম্যান অবশ্য রিপাকে বিবি রাসেলের ডিজাইন করা গামছা ফ্যাশনের বাসন্তী-লাল রং মিশানো একটি শার্ট দেখিয়ে বলেছিল, ভাইয়ার জন্য বসন্ত আর ভালোবাসার কম্বাইন্ড ডের ড্রেসটি নিতে পারেন। ভাইয়ার ফিগারে মানাবে বেশ।

সেলসম্যানের কথা শুনে মুখে রাখঢাক না রেখে ইমন বলেছিল, ওইসব হিজড়ামার্কা পোশাক রেখে দেন। ওটারও কাস্টমার পাবেন।

কেনাকাটা শেষে ওরা দোকান থেকে বেরিয়ে শপিংমলের চার তলার খাবারের দোকান বুমার্সের দিকে পা বাড়াল। যাওয়ার পথে রিপা ইমনকে বলল, গামছা ফ্যাশনের ড্রেসটা কিন্তু তোকে সত্যি

মানাত।

ইমন বলল, আপু, আমি কি ওইসব ড্রেস পরি নাকি? তোর পরতে ইচ্ছা হলে কিনলেই পারতিস!

—আমাকে মানালে তো আমি কিনেই ফেলতাম।

—আচ্ছা, আজকের শপিঙের টাকা কে দিয়েছে রে?

—বাবা সকালে অফিসে যাওয়ার সময় দিয়ে গেছে।

—কই, সারাদিন আমাকে কিছুই তো বলিসনি?

—তোকে সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য চেপে ছিলাম। আর বললে তুই যদি মার্কেটে না-আসার বাগড়া দিস সে ভয় ছিল।

—বুঝছি, তোরা আমাকে সব সময় মেয়েলি সাজে দেখতে চাস এই তো?

—তুই তো আমার মতো বাবা-মায়ের মেয়েই। এখন বড়ো হয়েছিস, তারা তোকে এখন মেয়ে হিসেবেই দেখতে চাইবে এটাই তো স্বাভাবিক।

—যাই বলিস না, মেয়েদের সাজসজ্জা আমার কেন যেন একেবারেই ভালো লাগে না।